# বাংলা থিয়েটার এবং অদামৃতকথা : সাহিত্য-ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা

পিনাকী রায়

বিশিষ্ট বাঙালি শিক্ষাবিদ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৫৪-১৯৩২) যখন নিজ-গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের (১৮৩৬-৮৬) উপদেশমূলক ভাষণ এবং কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে *কথামৃত ভবন* থেকে ১৯০২ থেকে ১৯৩২ পর্যন্ত (পর্যায়ক্রমে) *শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ-কথামৃত* প্রকাশ করেছিলেন, তখনও পূর্ণমাত্রায় 'বেঙ্গল রেনেসাঁস' বা 'বাংলার (সাহিত্য, সংস্কৃতি, এবং শিল্পকাণ্ডে) পুনর্জাগরণ' চলছে (যা শেষ হয়েছিল ১৯৪১ সালে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণের পরে)।

অবশ্য, 'পুনর্জাগরণ' কথাটা বলা হয়ত ভুল! কারণ, অষ্টাদশ শতাব্দীতে পলাশীর যুদ্ধ শেষ হওয়ার (২৫শে জুন, ১৭৫৭) অনতিবিলম্বে বাংলার সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিক্ষা, দার্শনিক ও সামাজিক চেতনায়, এবং (সর্বোপরি) ইংরেজদের করালগ্রাস থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পক্ষে চিন্তাভাবনায়, যে একটি তথাকথিত 'জোয়ার' এসেছিল, তারপর থেকে তা আর কখনোই সেই অর্থে 'বাধাপ্রাপ্ত' হয়নি। এখনও — এই একবিংশ শতাব্দীতেও — কিন্তু সর্বদা বাঙালির মনে-মননে বিভিন্ন বিষয়ে চমকপ্রদ, সদর্থক, এবং প্রশংসাযোগ্য চিন্তাভাবনা কাজ করে থাকে।

এই কথা অনস্বীকার্য যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশক পর্যন্ত বাংলার শিক্ষা-শিল্প-সংস্কৃতিতে যে অনায়াস-প্রাচুর্য এসেছিল, তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যাওয়াটা যে কোনও যুগের বুদ্ধিজীবীদের পক্ষেই খুব কষ্টসাধ্য হতে পারে। ১৯৫৬ সালে লেখা ব্যোমকেশ-বক্সীর-গল্প *রক্তের দাগ*-এ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭০) হয়ত এই সময়ের সমাজব্যবস্থায় পুরুষ এবং নারীদের সহজ মেলামেশা নিয়ে কিছুটা ব্যঙ্গ করেছেন, কিন্তু ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বহু বাঙালি লেখক এবং সমাজ-সংস্কারক যে ধরনের সামাজিক-সাম্যতার চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছিলেন, তার ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯২০ এবং ১৯৩০-এর দশকগুলোতে ভারতীয় পুরুষদের সঙ্গে ভারতীয় নারীরাও নিঃসঙ্কোচে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে পেরেছিলেন। এই ক্রমান্বয়ে-উন্নত হওয়া চিন্তাভাবনা এবং মানসিকতার নেপথ্যে পরিবর্তনশীল বাংলা নাটকের যে একটি বড় ভূমিকা ছিল, তা সর্বদাই উল্লেখ করা প্রয়োজন। 'বেঙ্গল রেনেসাঁস' থেকে এটি ছিল বাঙালিদের কাছে একটি বড় প্রাপ্তি।

তাই, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রী, নাটককার এবং চলচ্চিত্রকার অধ্যাপক ব্রাত্যব্রত বসু রায়চৌধুরীর (জ. ১৯৬৯) (ব্রাত্য বসুর) উপন্যাস *অদামৃতকথা* যখন ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে (পূর্ণাঙ্গ-গ্রন্থ-আকারে) কলকাতা-স্থিত *আনন্দ পাবলিশার্স* থেকে প্রকাশিত হল, তার বিষয় (১৯-শতাব্দীর

বাংলা থিয়েটার), 'কনটেক্সট', এবং প্রাসঙ্গিকতা নাট্যমোদী-জনগণ এবং গবেষকদের মধ্যে যথেষ্ট কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল। 'বেঙ্গলস গ্লোরিয়াস পাস্ট'-এর স্মৃতিরোমন্থনকারী অধ্যাপক বসুর এই উপন্যাসটির নাম রামকৃষ্ণদেবের 'কথামৃত'-কে পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেয়। তার যে কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই, তা কিন্তু কখনোই বলা যাবে না। বরং ইতিহাসাশ্রিত এই উপন্যাসে এমন কতগুলি চরিত্র রয়েছেন যাঁরা রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন।

বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস নিয়ে বাংলা (এবং ইংরেজি) ভাষায় লেখা (ইতিহাসাশ্রিত এবং) সমালোচনামূলক গ্রন্থের সংখ্যা খুব কম নয়। তার মধ্যে রয়েছে প্রভুচরণ গুহ-ঠাকুরতার *দ্য বেঙ্গলী ড্রামা : ইটস অরিজিন এণ্ড ডেভেলপমেন্ট* (১৯৩০), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস* (১৯৩৯) এবং তাঁরই লেখা *বেঙ্গলী স্টেজ, ১৭৯৫-১৮৭৩* (১৯৪৩), অজিত কুমার ঘোষের *বাংলা নাটকের ইতিহাস* (১৯৪৬), আশুতোষ ভট্টাচার্যের *বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস, ১৭৯৫-১৯০০* (১৯৬৮), সুরেশ চন্দ্র মৈত্রের *বাংলা নাটকের বিবর্তন* (১৯৭১), কিরণময় রাহার *বেঙ্গলী থিয়েটার* (১৯৭৮), সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর *বাংলা ঐতিহাসিক নাটক সমালোচনা* (১৯৮১), দীপক চন্দ্রর *বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা* (১৯৮২), সুশীল মুখোপাধ্যায়ের *দ্য স্টোরি ওফ্ দ্য ক্যালকাটা থিয়েটারস, ১৭৫৩-১৯৮০* (১৯৮২), এম্. আর. আখতার মুকুলের *বাংলা নাটকের গোড়ার কথা* (১৯৯৪), দর্শন চৌধুরীর *বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস* (১৯৯৫), নৃপেন্দ্র সাহার *বাংলা থিয়েটারের পূর্বাপর* (১৯৯৯), মলয় রক্ষিতের *বাংলা থিয়েটার : অন্য ইতিহাস* (২০১৭), এবং অংশুমান ভৌমিকের *এ নাটকে কোনো বিরতি নেই* (২০২০)। তালিকাটি বেশ দীর্ঘ, এবং সমৃদ্ধ।

কিন্তু প্রায় প্রতিটি বইয়েই একটি বিশেষভাবে-উল্লেখযোগ্য তথ্য রয়েছে : বঙ্গদেশে আধুনিক থিয়েটার শুরু হয়েছিল একজন রুশ ভাষাবিদ এবং লেখকের হাত ধরে — যাঁর নাম গেরাসিম লেবেদেফ (১৭৮৯-১৮১৭)। প্রখ্যাত নাটককার মামুনুর রশীদের *লেবেদেফ* (১৯৯৫) নাটকটি এই রুশ লেখকের স্মৃতিচারণ করে। অষ্টাদশ-শতাব্দীর একদম শেষ দিকে লেবেদেফ ভারতে-অবস্থানকারী ব্রিটিশ নাটককারদের সঙ্গে সাংস্কৃতিকস্তরে প্রতিযোগিতায় নেমে (অধুনা) কলকাতার ৩৭, এজরা স্ট্রিট (তৎকালীন: ২৫, ডোমতলা) অঞ্চলে *দ্য বেঙ্গলী থিয়েটার* নামে একটি নাট্যশালা গড়ে তোলেন। সেখানে ২৭শে নভেম্বর, ১৭৯৫ তারিখে প্রথম প্রদর্শিত হয় সংবদল — রিচার্ড পল জর্দেসের (আনু. ১৭৮৭-এ) লেখা *দ্য ডিসগাইজ* নাটকের (লেবেদেফ-কর্তৃক) বাংলায় অনূদিত রূপ। এছাড়াও মঞ্চস্থ করা হয় ফরাসী নাটককার মলিয়েরের লেখা (এবং ইংরেজিতে অনুবাদ করা) নাটক *লাভ ইজ দ্য বেস্ট মেডিসিন* (আনু. ১৬৬৫)-এর বাংলা অনুবাদ (কুমার ১২)। এই দুটি অনূদিত নাটকেরই শব্দপ্রক্ষেপণের দায়িত্বে এবং গানের রচয়িতা ছিলেন স্বয়ং লেবেদেফ। সাহিত্য-ইতিহাসবিদ আর. কে. ইয়াগ্নিক (৮৩-৮৪) এবং প্রভুচরণ গুহ-ঠাকুরতা (৪০-৪৪) যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, বাংলা নাটকের ইতিহাস এবং আধুনিক ভারতীয় থিয়েটারের উৎপত্তির কাহিনি প্রায় একই। একজন রুশ অনুবাদকের হাত ধরে যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল বাংলা থিয়েটারের এবং/তথা ভারতীয় ইংরাজি নাটকের, সেগুলি উৎপত্তিগত ভাবেই যে 'উত্তর-ঔপনিবেশিক' ছিল, তা বলা যেতেই পারে।

তার কারণ ছিল মূলতঃ দুটি। প্রথমত, উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় নাটকের সূত্রপাতের একটি উৎস ছিল তৎকালীন ইংরাজি নাটক। ব্রিটিশদের সমাজ দর্শন এবং 'কলোনিয়াল ইণ্ডিয়া'-তে নিজেদের, এবং তাঁদের 'সাবলটার্ন সাবজেক্টস'-দের দৈনন্দিন জীবনযাপনের খণ্ড-খণ্ড ছবি তার মধ্যে প্রতিফলিত হত। তাই, সেই সময়ে একজন রুশ অনুবাদকের হাত ধরে একটি ফরাসী নাটকের বাংলা নাট্যরূপ এবং

কলকাতার একটি রঙ্গমঞ্চে তার প্রদর্শন অবশ্যই ছিল এক ধরনের 'বিকেন্দ্রিকতার' প্রতীক। মজার বিষয় হল এই যে, এ ধরণের 'বিকেন্দ্রিকতা' ভারতীয় স্বাধীনতার প্রায় ১৫০ বছর আগে থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজ সাহিত্যিকদের বাইরে গিয়ে এই চিন্তা দেরীদিয় 'ডিকনস্ট্রাকশন'-এর মাধ্যমে ফিরে দেখা যেতে পারে। এটি ছিল প্রবল পরাক্রমশালী (শ্বেতাঙ্গ) ইংরেজ শাসকদের 'কালচারাল মনোপলি'-র একটি বিকল্পতা; 'পার্সিভড্ সেন্ট্রালিটি' থেকে তাঁদের সরানো : যা এক ধরনের উত্তর-ঔপনিবেশিক প্রচেষ্টাও বটে!

দ্বিতীয়ত, লেবেদেফের পর থেকে ভারতীয় (তথা বাংলা) নাটকে যে বিষয়গুলি আসতে শুরু করে, তার বেশিরভাগটাই ছিল ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী-আশ্রিত এবং ভারতীয়-ইতিহাসে-সুবিখ্যাত রাজা, রানি, ও সমর-নায়কদের উপাখ্যান। এই বিশেষ সাহিত্য ধারাটি সংস্কৃতির রণাঙ্গনে শ্বেতাঙ্গ 'ব্রিটিশ ইউরোসেন্ট্রিজেম'-কে সরাসরি দ্বন্দ্বে আহ্বান করেছিল। ভারতীয় ঐতিহ্য, পৌরাণিক উপাখ্যানের প্রাচীনত্ব, এবং দেশীয় ইতিহাসকে সর্বসমক্ষে প্রশংসাসূচক 'রিভিউইং' এই উত্তর-ঔপনিবেশিকতার আর একটি অঙ্গ ছিল। এর মাধ্যমেই হয়ত প্রথম বারের জন্য পরাভূত ভারতবাসীরা 'ন্যাশনালিজম' বা 'ন্যাশনাল কনশাসনেস'-এর বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পান। 'ইণ্ডেজেনাসনেস' বা 'সচেতন স্থানীয়তা' যে ব্রিটিশ 'ইউরোসেন্ট্রিজেম'-কে পরাজিত করতে পারে, এবং 'সাবলটার্ন' জনগণের মধ্যে এক ধরনের ঐক্য তৈরি করতে পারে, তার প্রথম 'প্রদর্শন' বোধহয় বাংলা থিয়েটারই করেছিল।

'বেঙ্গল রেনেসাঁস'-এর মধ্যে থেকে, এই সুবিশাল কর্মকাণ্ডের ধারাটি যাঁরা যত্নসহকারে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিনটি নাম বারংবার উল্লেখ্য: গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২), অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফি (১৮৫০-১৯০৮), এবং অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯)। এই তিনজনই অধ্যাপক বসুর ২০২২-এর প্রকাশনায় (*অদামৃতকথা*-তে) বাংলা-নাটক-রঙ্গমঞ্চের তিন মূল 'গায়েন'।

(১৯৯৩-এর *প্রাচ্য* এবং ১৯৯৪-এর *ওরা পাঁচজন* 'অ্যাডাপটেশন' দুটি বাদ দিয়ে) ১৯৯৬ সালে *অশালীন* দিয়ে শুরু করে ২০২৩ সালে *প্রতিভাস* থেকে প্রকাশিত *ফেনশীর্ষ সাগরের ডুবুরি* — একের পর এক কালজয়ী নাটকের রচনাকারের (এবং কিছু ক্ষেত্রে রূপকারের) এটি প্রথম উপন্যাস। উপন্যাসটির মূল বিষয় — এটি বলা যেতেই পারে — ভারতীয় (তথা বাংলা) নাটকের (যুগের প্রয়োজনে) 'কমার্শিয়ালাইজেশন'-এর উপাখ্যান (যার কট্টর বিরোধী ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ)। কিন্তু, এই 'ইতিহাস-আশ্রয়-তা' ছাড়াও *অদামৃতকথা*-র আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, এই উপন্যাসটির প্রশংসাযোগ্য মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। নাট্য-রণাঙ্গনে দুই সহযোদ্ধা অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফী এবং অমৃতলাল বসুর মধ্যে সম্পর্কের বিভিন্ন 'প্রকার' এবং 'অধ্যায়' — সেগুলির আলোচনায় সম্বৃদ্ধ এই প্রকাশনাটি।

প্রকৃত অর্থে বলতে গেলে, 'ভারতীয় থিয়েটার' বা 'বাংলা নাটক' — এই শব্দগুলো সচরাচর বৃহদর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রিচার্ড স্টোনম্যান *দ্য গ্রীক এক্সপিরিয়েন্স ওফ্ ইণ্ডিয়া* (৪১৩)-তে হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, ভারতীয় নাটকের উৎপত্তি ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বে। এছাড়াও, মনোহর লক্ষণ ভরদপাণ্ডে নিজের লেখা *হিস্ট্রি ওফ্ ইণ্ডিয়ান থিয়েটার*-এর বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করেছেন যে, খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দীতে পূর্ণমাত্রায় ভারতীয় নাটক মঞ্চস্থ করা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

*ভরত মুনির নাট্যশাস্ত্র* (আনু. খ্রীষ্টপূর্ব ২০০)-তে বর্ণিত নাটকের বিভিন্ন অংশগুলি (মূলত অভিনয়, নৃত্য, সঙ্গীত, পোশাক, ইত্যাদি) প্রাচীন নাটকের মধ্যে প্রয়োগের বিষয়টি যেমন লক্ষ্য করা যেত, তেমনই কাশ্মীরি দার্শনিক অভিনবগুপ্ত (খ্রিষ্টাব্দ আনু. ৯৫০-১০১৬)-এর লেখা *অভিনবভারতী* গ্রন্থে বিভিন্ন 'রস'-এর যে উল্লেখ রয়েছে, এই নাটকগুলোতে সেগুলির উপস্থিতি বিদ্যমান। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, ক্রমান্বয়ে

'স্বকীয়তা' লাভ করতে করতে বাংলা থিয়েটার যখন 'ভারতীয়' উপাদান ছেড়ে — তথাকথিত 'ম্যাক্রো-কনসার্নস' ত্যাগ করে — 'বাঙালি' উপাদানে বা 'মাইক্রো-কনসার্নস'-এ অলংকৃত হচ্ছে — তখনও কিন্তু ভরত মুনি এবং অভিনবগুপ্তের লেখার 'অ্যাসপেক্টস'-গুলি বহুলাংশে এগুলিতে (বিশেষ করে, ১৯ শতাব্দীর বাংলা নাটকে) বিরাজমান! অপরদিকে, এটিও উল্লেখ্য যে, প্রাচীন ভারতীয় নাটক, বা যে যুগে ক্রমশঃ ভারতীয় সংস্কৃত ভাষার নাটক থেকে বাংলা নাটকগুলি বিবর্তিত হচ্ছে, সেই সময় নাটকগুলি জনসমক্ষে এবং খোলা জায়গায় করা হত। অপরদিকে, যখন বাংলা নাটক 'প্রাপ্তবয়স্ক' হচ্ছিল, তখন তা ছিল নিতান্তই 'ব্যক্তিগত মনোরঞ্জনের' উদ্দেশ্যে সৃষ্ট। জমিদার এবং 'বাবু' সম্প্রদায়ের মানুষেরা নিজেদের 'সংস্কৃতি-পিপাসা' চরিতার্থ করার জন্যে যে (অন্দরমহলে প্রদর্শনের জন্যে) বাংলা নাটকের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, তার সুফল পরে আপামর বাঙালিরাই লাভ করেছিলেন।

লেখক, গবেষক, এবং নাটককার হিসেবে অধ্যাপক বসুর সার্থকতা হচ্ছে এই যে, তিনি 'বেঙ্গল রেনেসাঁস'-এর একটি দুর্দান্ত খণ্ডকালকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে *অদামৃতকথা*-তে বর্ণনা করতে পেরেছেন, সর্বসাধারণের জন্য। তাই বলে লঘু 'ডেমোটিক' বাংলা ভাষার সাহায্য লেখক নেননি। বরং, সহজবোধ্য অথচ 'হাইরেটিক' ভাষার প্রয়োগে এবং কিছু ক্ষেত্রে, কোনও নির্দিষ্টকরণ ছাড়াই আধুনিক ইংরেজী শব্দের প্রয়োগে নিজের বক্তব্যকে এবং গবেষণাকে নিয়ে এসেছেন পাঠকদের সম্মুখে। কথায় আছে, ''ভু পপুলি, ভু দেই''! সাধারণ পাঠক এই উপন্যাসকে এখন একটি মনোরঞ্জনমূলক রচনা বলবেন, না একটি 'গবেষণা-সন্দর্ভ' বলে সম্বোধন করবেন, তা নিশ্চয়ই তাঁদের ব্যক্তিগত বিষয়। বেশ কিছু পাঠক পরবর্তীতে *অদামৃতকথা*-র ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে আন্তর্জালে মন্তব্য করছেন যে, এটি একটি 'রিসার্চ পেপার'। কথাটি এক অংশে সত্যি! ২৪০ পৃষ্ঠার উপন্যাসের পরে অধ্যাপক বসু ১০ পৃষ্ঠার একটি সুবৃহৎ সূত্র-এবং-পরবর্তী-গবেষণার-জন্য-নির্বাচিত-গ্রন্থ-তালিকা দিয়েছেন। পাঠকেরা একবার ভাল করে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে, ১০ পৃষ্ঠার সেই তালিকায় রয়েছে ১১২টি গ্রন্থের এবং ৮ খানা প্রবন্ধের নাম এবং অন্যান্য তথ্য। 'বেঙ্গল রেনেসাঁস'-এর একটি মহা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের ওপর লিখতে গিয়ে অধ্যাপক বসু গবেষণার কোনও ত্রুটি রাখেননি, তা এই তালিকাটিতে একবার দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায়।

অপরদিকে, আটখানা অধ্যায়ের প্রতিটি অংশে অধ্যাপক বসু কিছু কাল্পনিক ঘটনা বা অবস্থার কথা অবতারণা করেছেন। সেটি প্রথম অধ্যায়ে *কিছু কিছু বুঝি*-নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার পরে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির নিজের বাসভবনে বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটির দৃশ্যই হোক (বসু ১৬-১৯), আর (অন্তিম) অধ্যায় ৮-এ অমৃতলাল বসুর সঙ্গে ঘোড়ায়-চড়া-প্রয়াত অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির সাক্ষাৎকারই হোক (ঐ ২১৮-২০) : নাটককারের কলম কিন্তু কল্পনা রচনাতেও ইতিহাস অবতারণার মতোই পারদর্শী। তাই, এটা মন্তব্য করা যেতেই পারে যে, উপন্যাসটির বক্তব্য মাঝে মাঝে খুব সরল মনে না হলেও, গবেষণা, কৌতুক, এবং উপস্থাপনায় *অদামৃতকথা* সত্যিই প্রশংসাযোগ্য!

অনেক সাহিত্য সমালোচকই বলে থাকেন যে জুলাই ১৭৯৮ এ রচিত উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের ''লাইনস রিটেন আ ফিউ মাইলস অ্যাবোভ টিন্টার্ন অ্যাবে'' তাঁর একটি 'থিসিস পোয়েম'। ওয়ার্ডসওয়ার্থীয় যাবতীয় কল্পনা, দর্শন, বিশ্বাস, এবং বক্তব্য এই কবিতাটির মধ্যে বিদ্যমান। ঠিক তেমনই, *অদামৃতকথা* অধ্যাপক বসুর ক্ষেত্রে একটি 'থিসিস কম্পোজিশন' হিসেবে দেখা যেতে পারে। একজন নাটককারের বোধহয় ১৯ শতাব্দীর বাংলা নাটকের ইতিহাস নিয়ে এর চাইতে বেশি কিছু লেখার থাকতে পারে না!

বাংলা থিয়েটারের যে অংশটি বা সময়টি নিয়ে অধ্যাপক বসু *অদামৃতকথা*-তে লিখেছেন, তা ঘটনার ঘনঘটায় ভরা ছিল। প্রকৃত অর্থে, বঙ্গদেশে দেশীয় থিয়েটার তৈরি করাটাই ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এক ধরনের দ্বন্দ্বে আহ্বান করা। ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে অধুনা কলকাতার নিউ চায়না মার্কেট-অঞ্চলে যে

'ক্যালকাটা থিয়েটার' নির্মিত হয়েছিল, তার তদারকিতে ছিলেন বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৩২-১৮১৮) স্বয়ং। এর ১৪ বছর পরে ব্রিটিশরা আরও একটি 'থিয়েটার হাউজ' তৈরি করে ফোর্ট উইলিয়াম সংলগ্ন অঞ্চলে। নির্মাতা ছিলেন (ব্রিটিশ) রাজকীয় সামরিক বাহিনীর একজন সদস্য, জন ব্রিস্ট[১]। বলাই বাহুল্য, অন্যান্য ইংরেজ নির্মিত রঙ্গমঞ্চের মত এটাতেও মধ্যবিত্ত বা সাধারণ বাঙালিদের প্রবেশাধিকার ছিল না। তাঁদের জন্যে বরাদ্দ ছিল কয়েকজন 'মানবিক' জমিদারদের বাড়ির নাট-মন্দির, যেখানে উপজীব্য ছিল কিছু চড়া দাগের প্রহসন এবং ঝুমুর-গান।

১৭৯৭ সালে ইংরেজ শাসকদের অত্যাচারে লেবেদেফ কলকাতা ত্যাগ করতে বাধ্য হলে অনেকদিন বাঙালির নাট্যচর্চা বন্ধ ছিল। এর ঠিক ২০ বছর পরে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) গরানহাটায় একজন বিশিষ্ট মানুষের বাড়ির একটি অংশে *হিন্দু কলেজ* স্থাপন করেন, এবং অচিরেই সেই মহাবিদ্যালয়ের ইংরেজী ছাত্ররা বিভিন্ন ইংরেজি সাহিত্যের নাটকের অনুবাদ করতে থাকেন। অবধারিতভাবে খোঁজ পড়ে দেশীয় 'থিয়েটার হাউস'-এর। *সমাচার চন্দ্রিকা* এবং *সমাচার দর্পণ* পত্রিকায় বিভিন্ন প্রবন্ধে অবিলম্বে রঙ্গমঞ্চ স্থাপনে সাহায্য করার জন্যে আপামর জনসাধারণকে আহ্বান জানানো হতে থাকে[২]। ১৮২২ সালে দুটি প্রাচীন নাটক অনুবাদ করা হয় ঠিকই, কিন্তু সেই দুটি — *আত্মতত্ত্ব কৌমুদী* এবং *হাস্যার্ণব* — জনমানসে খুব একটা দাগ কাটতে পারেনি[৩]।

এর পরে ১৮৩১ সাল থেকে (১৮৫৭ সালের) মহাবিদ্রোহের পরবর্তী কয়েক বছর পর্যন্ত কলকাতায় একের পর এক 'সখের থিয়েটারের' রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হতে থাকে — বেশির ভাগই বিভিন্ন সম্পন্ন ব্যবসায়ীর বাড়িতে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য এবং জনপ্রিয় ছিল নারকেলডাঙার প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে স্থাপিত 'হিন্দু থিয়েটার' (১৮৩১), শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্রের বাড়িতে তৈরি 'শ্যামবাজার থিয়েটার' (১৮৩৫; যেখানে মেয়েরা অভিনয় করতে পারতেন), 'নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাট্যশালা' (১৮৩৫), 'ওরিয়েন্টাল থিয়েটার' (১৮৩৫), জোড়াসাঁকোর প্যারীমোহন বসুর বাড়িতে অবস্থিত 'জোড়াসাঁকোর থিয়েটার' (১৮৫৪), 'বিদ্যোৎসাহিনী মঞ্চ' (১৮৫৭), আশুতোষ দেবের বাড়িতে 'সাতুবাবুর থিয়েটার' (১৮৫৭), পাইকপাড়ায় 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা', চিৎপুরের সিঁদুরিয়া পট্টিতে 'মেট্রোপলিটান থিয়েটার' (১৮৫৯), এবং 'বাগবাজার এমেচার থিয়েটার' (১৮৬৮) (দত্ত ১০৬৬-৬৮)।

এই 'এমেচার থিয়েটার' — বোঝাই যাচ্ছে — খুব একটা বেশিদিন চলে নি। এর পর মহানগরীতে শুরু হয় 'প্রফেসনাল থিয়েটার' বা পেশাদারি নাটকের যুগ। অধ্যাপক বসুর ২০২২-এর উপন্যাস এই 'ট্রানজিশনাল ফেজ'-টিকেই ধরেছে।

১৪ই জানুয়ারী, ২০১৯-এর *এই সময়* সংবাদপত্রে ''মৌলিক বাংলা নাটকের পেশাদার অভিনয়ের জয়যাত্রা'' নামক প্রবন্ধে সমীরণ চন্দ্র বণিক এই বিশেষ সময়টি নিয়ে লিখেছেন :

> ''লেবেদেফের নাটকের পর কেটে গেছে অনেক বছর। এরপরে বাঙ্গলা নাটক অভিনীত হয়েছে কোনো ধনী বা অভিজাত সম্প্রদায়ের বাড়িতে। কখনো কারো জলসাঘরে বা উঠোনে বা কোনো বাগানবাড়িতে। সেখানে কখনো কোনো নাটকের এক বা একাধিক শো হয়েছে। সবই হয়েছে ধনী ব্যক্তিদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায়। কারণ থিয়েটার করতে গেলে অর্থের প্রয়োজন। মঞ্চ তৈরি, মঞ্চসজ্জা, পোষাকআশাক এবং অন্যান্য বিষয়ের জন্য। সে খরচ কে যোগাবে অর্থবান মানুষ ছাড়া? তাছাড়া এসব থিয়েটারের দর্শকরা ছিলেন প্রায় সকলেই অভিজাত শ্রেণীর এবং সকলেই আমন্ত্রিত। সাধারণ মানুষের সেখানে অবাধ প্রবেশাধিকার ছিলনা। তাদেরই দলের গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তাঁর মতে, ভালো বাড়ি, ভালো স্টেজ না করে টিকিট বিক্রি করাটা ঠিক হবে না। তিনি এই কর্মযজ্ঞে সামিল না হলেও পরামর্শ দিলেন,

> মাইকেলের (মাইকেল মধুসূদন দত্ত ) কথামত সবাই মিলে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা তোলার চেষ্টা করো। এত টাকা যোগাড় করতে হলে শহরের ধনী মানুষদের কাছ থেকে চাঁদা নেওয়া দরকার। তাই তারা প্রথমেই গেলেন পাথুরিয়াঘাটার নাট্যমোদী ও ঠাকুরপরিবারের সুযোগ্য সন্তান যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ি। আপনারা জানেন যে যতীন্দ্রমোহনের উদ্যোগে পাথুরিয়াঘাটার *টেগোর ক্যাসেলে* ১৮৫৯ সালের জুলাই মাসে মহাকবি কালিদাসের সংস্কৃত নাটক *মালবিকাগ্নিমিত্রম* নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন যতীন্দ্রমোহনের ভগ্নীপতি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। চাঁদার কথা শুনে তিনি কিছু ব্যঙ্গোক্তি করলেন চাঁদাসংগ্রহকারীদের উদ্দেশ্যে। ফল যা হবার তাই হল। খালি হাতেই ফিরতে হল তাদের। খুব হতাশ হয়ে পড়ল তারা। প্রথমেই এই ব্যবহার পেতে হল তাদের। যাইহোক হতোদ্যম না হয়ে আরো কয়েকজন ধনী ব্যক্তির কাছে যাওয়া হল চাঁদার জন্য। কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু লাভ হল না। বোধহয় সাধারণ মানুষের কাছে টিকিট বিক্রি করে থিয়েটার করার ব্যাপারটা তাঁরা মেনে নিতে পারেননি। কারণ এর আগে এই ধরণের চিন্তা ভাবনা কেউ করেনি। আর এদেরও বোধহয় জেদ চেপে গিয়েছিল যে থিয়েটারকে আর বড়লোকদের বাড়ির সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে থিয়েটারকে পৌঁছে দিতে হবে সকলের মধ্যে। শেষে ঠিক হল বড়লোকদের কাছে আর হাত না পেতে বরং পাড়ার গেরস্তদের কাছে যাওয়াই ভালো। আর পাশাপাশি উদ্যোক্তারা ঠিক করলেন নিজেরাই সাধ্যমত কুড়ি পঁচিশ টাকা করে চাঁদা দিয়ে তাদের স্বপ্নটাকে সাকার করে তুলবেন। এইভাবে সর্বসাকুল্যে আদায় হল মাত্র আড়াইশো টাকা। কিন্তু এই টাকায় কি হবে! নাটকের জন্য দরকার আরো আরো টাকা। অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফি বললেন, স্টেজ ভাড়া করে টিকিট বিক্রি করে থিয়েটার করে কিছু টাকা তোলার চেষ্টা করলে কেমন হয়! কিন্তু গিরিশ ঘোষের এক কথা, ভালো বাড়ি ভালো স্টেজ না করে টিকিট বিক্রি করে থিয়েটার করতে তিনি রাজি নন। তিনি বিরক্ত হয়ে চলে গেলেন।"[৪]

যদি সখের নাট্যশালার তালিকায় পাঠকেরা উজ্জ্বল সব 'তারকা' দেখতে পেয়ে থাকেন, তবে বাংলার পেশাদারি নাটকের রঙ্গমঞ্চে সবাই দেখতে পাবেন 'জ্যোতিষ্কের' প্রাচুর্য। এর মধ্যে অনেকগুলি পেশাদারি নাট্যশালারই উল্লেখ রয়েছে *অদামৃতকথা*-য়।

এই 'প্রফেসনাল' নাট্যশালাগুলির মধ্যে প্রথমেই আসে 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর নাম। ডিসেম্বর ১৮৭২-এ এই নাট্যদল এবং রঙ্গমঞ্চের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। মে ১৮৭২-র দ্বিতীয় সপ্তাহে শ্যামবাজারে একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর বাড়িতে দীনবন্ধু মিত্রের একটি নাটক 'বাগবাজার এমেচার থিয়েটার'-এর সদস্যরা মঞ্চস্থ করেন। অভিনয়ের সময় পর পর কয়েকদিন দর্শকদের ভিড় এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে এই নাটক দেখবার জন্য টিকিট বিক্রির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সদস্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেন, এবং রঙ্গমঞ্চ উদ্বোধনের আগে দল ত্যাগ করেন। অধ্যাপক বসুর উপন্যাসে তাঁর বিভিন্ন সময়ে এই বারংবার দলত্যাগকে 'শুধু আসা যাওয়া' বলে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর মতো 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'-ও ছিল পেশাদারি রঙ্গমঞ্চে একটি অতি পরিচিত নাম। ৬, বিডন স্ট্রটে মহেন্দ্রনাথের দাসের বাড়িতে রঙ্গমঞ্চটি তৈরি করেন বাগবাজারের ধনকুবের ভুবনমোহন নিয়োগী (১৮৫৮-১৯২৭), *অদামৃতকথা*-তে যাঁর কথা অধ্যাপক বসু খুবই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন (বসু ৩১-৫৪)। ইংরেজ মঞ্চশিল্পী গ্যারিক এক সময় এই প্রেক্ষাগৃহে দৃশ্যপট তৈরি করতেন।

অধ্যাপক বসু বর্ণনা করেছেন যে, কিভাবে ৮ই মার্চ, ১৮৭৩ সালের রাতে 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর

একটি নাটক উপস্থাপনা শেষ হলে নাট্যদলটি দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় (বসু ৭৩-৭৪)। এর একটি হল গিরিশচন্দ্র ঘোষ-এর নেতৃত্বে 'ন্যাশনাল থিয়েটার', এবং অন্যটি হল অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি-পরিচালিত 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার'। এই দুই দল থেকে প্রেরণা নিয়ে 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর মঞ্চশিল্পী ধর্মদাস সুর একসঙ্গে মিলে 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করেন।

'বেঙ্গল থিয়েটার' স্থাপিত হয় ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে। আশুতোষ দেবের নাতি শরৎচন্দ্র ঘোষ মহানগরীর ৯, বিডন স্ট্রিটের কাছে একটি মাঠে নাট্যমঞ্চটি তৈরি করেন। এটি বঙ্গদেশের প্রথম রঙ্গমঞ্চ যা সম্পূর্ণভাবে নির্মিত হয়েছিল জনসাধারণের শেয়ারের টাকায়। 'বেঙ্গল থিয়েটার'-এর আরও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। এখানে প্রথম মেয়েরা বিনা বাধায় পেশাদারিভাবে নারী চরিত্রগুলিতে অভিনয় করতে পারতেন। সে যুগের কিছু পরিচিত দেহোপজীবিনী — জগত্তারিণী, গোলাপ (সুকুমারী), এলোকেশী এবং শ্যামা — এখানে নিয়মিত অভিনয় করতেন। পরে তাঁদের চাইতে অনেক বেশি খ্যাতি লাভ করেন বিনোদিনী দাসী (১৮৬২-১৯৪১) এবং তারাসুন্দরী (১৮৭৮-১৯৪৮)।

১৮৭৩ সালে শ্যামবাজারে 'ওরিয়েন্টাল থিয়েটার' নামে আরও একটি পেশাদারি নাট্যমঞ্চের উদ্বোধন করা হয়। এটি যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল।

'বেঙ্গল থিয়েটার' স্থাপিত হওয়ার ঠিক ১০ বছর পরে, ১৮৮৩ সালে কলকাতাতে প্রায় একই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় 'স্টার থিয়েটার'। তা পরে স্থানান্তরিত হয় হাতিবাগান এলাকায়। গিরিশচন্দ্র ঘোষের নতুন নাট্যদলের বাসনা এবং (রাজস্থানের মন্দাওয়ার থেকে শহর কলকাতায় পাড়ি দেওয়া) অঙ্কনশিল্প ব্যবসায়ী গুর্মুখ রায় মুসাদ্দির (১৮৬৪-৮৬) নটী বিনোদিনীর জন্যে তীব্র প্রেম পরিণতি পায় 'স্টার থিয়েটার' স্থাপনে।

'স্টার থিয়েটার' খুব একটা বেশিদিন জনপ্রিয় থাকতে পারেনি। পরবর্তীতে, গোপাললাল শীল এটিকে কিনে নিয়ে 'এমেরাল্ড থিয়েটার' স্থাপন করেন। ১৮৯৭ সালে 'এমেরাল্ড থিয়েটার' অমরেন্দ্রনাথ দত্তর নতুন মালিকানায় 'ক্লাসিক থিয়েটার'-এ পরিণত হয়। এছাড়াও, বিডন স্ট্রীটে নগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'মিনার্ভা থিয়েটার' (১৮৯৩), 'অরোরা থিয়েটার' (১৯০৬), 'কোহিনুর থিয়েটার' (১৯০৭), এবং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের 'বিশ্বরূপা থিয়েটার' (আনু. ১৯৩০) পেশাদারি বাংলা নাট্যজগতের (এবং ছায়াছবি তৈরির) অতি বিখ্যাত কিছু রঙ্গমঞ্চ ছিল, যাদের বেশ কিছু উল্লেখ রয়েছে অধ্যাপক বসুর প্রথম উপন্যাসে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের জীবনী কমবেশি অনেকেই জানেন। মদ্যপ হিসেবে কুখ্যাতি কুড়োলেও ১০০টির বেশি নাটক লিখে 'বেঙ্গল রেনেসাঁস'-এর একটি চিরস্মরণীয় চরিত্রে পরিণত হয়েছেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। পরবর্তী জীবনে তিনি হয়ে উঠেছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একনিষ্ঠ একজন শিষ্য। অধ্যাপক বসু নিজের উপন্যাসে গিরিশচন্দ্র ঘোষের সম্পর্কে যতটা হয় 'অবজেকটিভ' থাকবার চেষ্টা করেছেন। তাঁকে নিয়ে মার্জিত কৌতুক করলেও লেখক কোনও 'চারিত্রিক স্খলনের কারণে' গিরিশচন্দ্র ঘোষকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেননি।

বরং বাগবাজার এলাকায় জন্ম নেওয়া এবং পরবর্তীতে একজন বিখ্যাত রঙ্গমঞ্চ অভিনেতা, নির্দেশক, এবং লেখক অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি একবিংশ শতাব্দীর নবীন প্রজন্মের কাছে গিরিশচন্দ্র ঘোষের তুলনায় খানিকটা কম পরিচিত। ১৮৬৭ সালে অভিনয় শুরু করে ১৯০৮ সালে নিজের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত একের পর এক নাটকে নিজের শৈল্পিক উৎকর্ষের ছাপ রেখে গিয়েছেন মুস্তাফি। নির্ভুল ইংরেজি উচ্চারণ, পশ্চিমি আদব-কায়দা, দৃপ্তকণ্ঠে সংলাপ প্রক্ষেপণ করে, এবং গুরুগম্ভীর ও হাস্যরসাত্মক সব ধরনের

অভিনয় করে বাংলা রঙ্গমঞ্চে চিরস্মরণীয় হয়ে গিয়েছেন। অধ্যাপক বসুর *অদামৃতকথা* তাঁর প্রতি লেখকের একটি 'গ্লোয়িং ট্রিবিউট' তো বটেই!

তবে অধ্যাপক বসুর উপন্যাসে সবচেয়ে বেশি জায়গা যিনি অধিগ্রহণ করে রয়েছেন, তিনি হলেন অমৃতলাল বসু। মুস্তাফী যেমন মিলনান্তক, প্রহসন, এবং বিয়োগান্তক — সব রকম নাটকেই অভিনয় করতে পারদর্শী ছিলেন, বসুর 'এরিয়া ওফ্ স্পেশালাইজেশন' ছিল প্রহসন এবং ব্যঙ্গাত্মক নাটকগুলি। কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পরে পরবর্তী-যুগের 'রসরাজ' এবং 'নাট্যাচার্য' বেশ কিছুদিন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়েছিলেন। তারপর কিছুদিন হোমিওপ্যাথি নিয়ে পড়াশোনা করে এবং উত্তর প্রদেশে ঘুরে পাকাপাকি ভাবে কলকাতায় চলে আসেন এবং সর্বশক্তি নিয়ে রঙ্গমঞ্চের জগতে প্রবেশ করেন। ১৮৭৩ সালে মুস্তাফীর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বসু নাটক লেখা এবং নাটকে অভিনয় শুরু করেন, যা চলতে থাকে ১৯২৬-এর *ব্যাপিকা বিদায়* পর্যন্ত। ১৮৭৬-এর মার্চ মাসে ইংল্যাণ্ডের যুবরাজ এডওয়ার্ডকে নিয়ে লেখা চরম ব্যঙ্গাত্মক একটি প্রহসনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত থাকার জন্যে ব্রিটিশ পুলিশ বসুকে ১৬ দিনের জন্যে কারাগারে বন্দী করে রেখেছিল। *অদামৃতকথা*-তে এই প্রতিটি বিষয়ই বিস্তারিত অথচ মনোজ্ঞ ভাবে বর্ণিত রয়েছে।

উপন্যাসের ৮টি অধ্যায় অধ্যাপক বসু অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি এবং অমৃতলাল বসুর জীবনযাপন এবং উল্লেখযোগ্য ঘটনার ভিত্তিতে ভাগ করেছেন — প্রতিটির 'প্রারম্ভিক' হিসেবে বিভিন্ন নাটকের গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাব্যাংশের বা কোনও দস্তাবেজ বা চিঠির নির্বাচিত অংশের উদ্ধৃতির 'অনুপান' সহযোগে।

অদামৃতকথা-র অধ্যায় ১-এ রয়েছে 'উপক্রমণিকা' এবং উত্তর প্রদেশে কাটানো অমৃতলাল বসুর বাল্যজীবনের কিছু খণ্ডচিত্র (বসু ১-৮)। অধ্যায় ২-এ রয়েছে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির সদ্য-যৌবনের কিছু কৌতুককর বর্ণনা, ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে তাঁর বিরোধের এবং (তার ফলশ্রুতিতে) কলকাতার মূল সাহিত্যাঙ্গন থেকে কিছুদিনের জন্যে তাঁর বিতাড়িত হওয়ার উপাখ্যান (ঐ ৯-১৯)। ১৯ শতাব্দীতে 'বেঙ্গল রেনেসাঁস'-এর 'ব্যাকগ্রাউণ্ড'-এ বাংলা থিয়েটারের অবস্থা এবং এর লেখক ও কুশীলবদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় অধ্যায় ৩ (ঐ ২০-৩০)। অধ্যায় ৪-এ বর্ণিত হয়েছে বাংলা নাটকের পৃষ্ঠপোষকতায় ভুবন নিয়োগীর অংশগ্রহণ এবং ক্রমশঃ তথাকথিত 'সখের থিয়েটার' থেকে 'পেশাদারি থিয়েটার'-এর দিকে বাংলা নাটকের ধাবমান হওয়ার সময়কালটি (ঐ ৩১-৫৪)। অধ্যায় ৫ শুরু হচ্ছে ব্রিটিশ পুলিশ-কর্তৃক অমৃতলাল বসু এবং আরও ৯ জন নাট্যব্যক্তিত্বকে গ্রেফতারের কাহিনি দিয়ে এবং পরবর্তী ৪৭ পৃষ্ঠায় অধ্যাপক বসু বাংলা থিয়েটারের পেশাগতভাবে-স্বাবলম্বী-হওয়ার কাহিনি, এবং তার সঙ্গে বাংলা পেশাদারি থিয়েটারের দলগুলির অভ্যন্তরীণ কোন্দল, সদস্যদের দলত্যাগ, নতুন-দল-গঠন, মুস্তাফি এবং বসুর মধ্যে ক্রমশ বদলে-যাওয়া সম্পর্কের কথা, এবং বাংলা নাটকের জগতে মেয়েদের স্থায়ীভাবে অবতীর্ণ হওয়ার কথা সুচারুভাবে এবং এক ধরনের রূপকহীন, ঝরঝরে বাংলা ভাষায় বর্ণনা করেছেন (ঐ ৫৫-১০২)। অধ্যায় ৬-এ পাঠকদের সঙ্গে 'নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ' এবং 'ব্যক্তি গিরিশচন্দ্র ঘোষ'-এর পরিচয় হয় (ঐ ১০৩-৩৬)। অধ্যায় ৭ মূলত অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির পরিণত জীবন এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষের বারংবার দল পরিবর্তনের বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এটি শেষ হচ্ছে মুস্তাফী, ঘোষ, এবং, শেষে, অমৃতলাল বসুর মৃত্যুর উল্লেখ করে (ঐ ১৩৭-২০৪)। উপসংহারী অধ্যায় ৮-এ অধ্যাপক বসু নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসুর একটি মনস্তাত্ত্বিক চিত্র কল্পনা করছেন, এবং ইঙ্গিত করেছেন যে নাট্যাচার্যের মধ্যে একটি দ্বৈতসত্তা কাজ করত (ঐ ২০৫-৪০)। (রোমান্টিক কবি জন কিটসের বর্ণিত) অধ্যাপক বসুর 'নেগেটিভ কেপেবেলিটি'-র একটি উৎকৃষ্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে শেষ হচ্ছে *অদামৃতকথা*।

*অদামৃতকথা*-র ঔপন্যাসিকের একটি বড় সাফল্য হল এই যে, তিনি মুস্তাফি এবং বসুকে তাঁদের

পেশাদারি জগতের বাইরে নিয়ে গিয়ে জনসমক্ষে পেশ করেছেন। একদিকে যেমন গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং বিনোদিনী দাসীর সম্পর্ক নিয়ে অধ্যাপক বসু সশ্রদ্ধভাবে মন্তব্যহীন, ঠিক তেমনই নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসুর মধ্যে এক ধরনের নারীসত্তার উপস্থিতি নিয়ে *অদামৃতকথা* কিছুটা কৌতূহলী; আবার কিছুটা সচেতনভাবেই অস্পষ্ট।

সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে, ঔপন্যাসিকের চোখে মুস্তাফি এবং বসুর সম্পর্কটি ছিল জটিল এবং রহস্যময়। উপন্যাসের শেষদিকটিতে অধ্যাপক বসু সযত্নে কিন্তু সশ্রদ্ধভাবে এই বিষয়টির ওপর একটি সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করে ছেড়ে দিয়েছেন।

৩১শে ডিসেম্বর, ২০২২-সালে লেখা একটি প্রবন্ধে দ্য ওয়াল এই ভাবে উপন্যাসটির ওপর আলোকপাত করেছে :

> ''ব্রাত্য বসুর লেখা উপন্যাসটির নাম *অদামৃতকথা*। এই উপন্যাসকে অনেকেই বলছেন অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বাংলা নাটক, তার বিবর্তনের দলিল। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফিকে বাংলার নাট্য জগৎ 'অদা' নামেই চেনে। সেই সূত্রেই নামটি ব্যবহার করেছেন ঔপন্যাসিক ব্রাত্য। কারও কারও মতে, ব্রাত্য বসুর লেখা *অদামৃতকথা* নাটকের ইতিহাসের 'অমৃতকথা'র মতোই। অর্ধেন্দুশেখর এবং অমৃতলাল দু'জনে সমসাময়িক নাট্যকার-নাট্যাভিনেতা। যাঁরা যাত্রাতেও সমানভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তবে অমৃতলাল বসু নাট্যবোধ নিয়ে বেড়ে উঠলেও তাঁকে এই জগতে টেনে নিয়ে এসেছিলেন দু'জন মানুষ — অর্ধেন্দুশেখর এবং আর এক কিংবদন্তি গিরিশচন্দ্র ঘোষ। এই দুই নাট্য মহীরুহের পারস্পরিক সম্পর্ক, রসায়ন ইত্যাদি নানান দিক তুলে ধরেছে ব্রাত্য বসুর কলম। সেইসঙ্গে গিরিশবাবুর মতো আরও অনেক নাট্য চরিত্রও সহজাতভাবে এসে গিয়েছেন লেখায়। উপন্যাসে প্রামাণ্য তথ্য হিসেবে যে ধরনের রসদ দিয়েছেন ব্রাত্য তা যে কোনও গবেষণার কাজকে অনেক সহজ করে দিতে পারে। সেইসঙ্গে এও বাস্তব, এই উপন্যাসের পিছনে ব্রাত্য বসুর গবেষণাও ছিল দীর্ঘ সময়ের। নাটক বা সিনেমাকে বলা হয় সময়ের দলিল। এই দুই নাট্যকার তাঁদের নাটকে সেই সময়কে ধরেছিলেন। সেইসঙ্গে পৌরাণিক বহু ঘটনাকেও নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। সাহিত্য সমালোচকদের অনেকের মতে, ব্রাত্যর এই উপন্যাস সামগ্রিকভাবে বাংলা নাটকের সেকালের দলিল হয়ে উঠেছে।''[৫]

১৭৯৮ সালে বিখ্যাত আবেগধর্মী কাব্যগ্রন্থ *লিরিকাল ব্যালাডস্* প্রকাশ করার সময় উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং স্যামুয়েল টেয়ইলর কোলরিজের মধ্যে একটি অলিখিত চুক্তি হয়েছিল বলে শোনা যায়। নিজের কবিতাগুলিতে ওয়ার্ডসওয়ার্থ 'ন্যাচারাল'-কে 'সুপারন্যাচারালাইজ' করবেন, আর কোলরিজ 'সুপারন্যাচারাল'-কে 'ন্যাচারালাইজ' করবেন। কোলরিজের বর্ণনায় অদ্ভুত এবং ভৌতিক বিষয়গুলি পাঠকের কাছে পেশ হবে একদম দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ঘটনাবলি হিসেবে। *অদামৃতকথা* উপন্যাসে অধ্যাপক ব্রাত্য বসু ঠিক এই কোলরিজিও-পন্থা অবলম্বন করেছেন। ইতিহাসের তথা বাংলার রঙ্গমঞ্চের বেশ কিছু ব্যক্তিত্বকে এমন সাধারণভাবে তুলে এনেছেন যে, পাঠকের মনে হবে তাঁরা আর পাঁচটি পরিচিত মানুষদের মতো। *অদামৃতকথা*-তে গিরিশচন্দ্র ঘোষের মতো নাট্যকার, বা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির এবং নটী বিনোদিনীর মত শক্তিশালী অভিনেতা-অভিনেত্রী এত সচ্ছন্দে পাঠকের 'অপ্রাইজিং-ভিশন'-এর আওতায় চলে আসছেন যে, তাঁদের জীবনযাপনের প্রতিটি অংশ বা 'ফেজ' পাঠকদের কাছে উন্মীলিত হয়ে যাচ্ছে। এটাই হয়ত অধ্যাপক বসুর 'ইউ-এস-পি'। তাঁর কলমে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা রঙ্গমঞ্চের এক বিস্তৃত, জটিল ইতিহাস হয়ে উঠেছে যথার্থই 'কথামৃতসম'।

**আন্তর্জাল থেকে গৃহীত তথ্য-নির্দেশিকা :**

১) ''বাংলা থিয়েটার''। অনুশীলন। গৃহীত ১২ই মার্চ, ২০২৩ <http-//onushilon.org/music/gen/banglaéôénatok.htm>

২) ঐ।

৩) ঐ।

৪) বণিক, সমীরণ চন্দ্র। ''মৌলিক বাংলা নাটকের পেশাদার অভিনয়ের জয়যাত্রা''। এই সময় ১৪ই জানুয়ারী, ২০১৯। গৃহীত ১২ই মার্চ, ২০২৩<https-//blogs.eisamay.indiatimes.com/puronokolkatargolpo/the-start-of-bengali-professional-theatre/>

৫) ''বাংলা নাটকের দুই প্রবাদপ্রতিম এবার উপন্যাসে, লিখলেন মন্ত্রী-নাট্যকার ব্রাত্য''। দ্য ওয়াল ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২২। গৃহীত ১২ই মার্চ, ২০২৩ <https-//www.thewall.in/entertainment/adamritakatha-novel-written-by-bratya-basu/>

**গ্রন্থপঞ্জী :**

ইয়াগ্নিক, আর. কে। দ্য ইণ্ডিয়ান থিয়েটার । নিউ ইয়র্ক: হাস্কেল হাউস পাবলিশার্স, ১৯৭০।

কুমার, নন্দ। ইণ্ডিয়ান ইংলিশ ড্রামা: আ স্টাডি ইন মিথস । নয়া দিল্লী : স্বরূপ এন্ড সন্স, ২০০৩।

গুহ-ঠাকুরতা, প্রভুচরণ। দ্য বেঙ্গলী ড্রামা: ইটস অরিজিন এণ্ড ডেভেলপমেন্ট । লণ্ডন: রাটলেজ, ১৯৩০। পুনঃ ২০০০।

দত্ত, অমরেশ (সম্পা.)। এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইণ্ডিয়ান লিটারেচার। ২য় সংখ্যা। নয়া দিল্লী: সাহিত্য একাডেমী, ১৯৮৮।

বসু, ব্রাত্য। অদামৃতকথা। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০২২।

ভরদপাণ্ডে, মনোহর লক্ষণ। হিস্ট্রি ওফ্ ইণ্ডিয়ান থিয়েটার। নয়া দিল্লী: অভিনব পাবলিকেশন, ১৯৮৭।

স্টোনম্যান, রিচার্ড। দ্য গ্রীক এক্সপিরিয়েন্স ওফ্ ইণ্ডিয়া। প্রিন্সটন: প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৯।

**পিনাকী রায়** : প্রাবন্ধিক ও অধ্যাপক, ইংরাজি বিভাগ, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়।